৩

পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি (১৯৪৭-৫৮)

ভূমিকা

পূর্ববাংলার ইতিহাসে ১৯৪৮-৫৮ সাল গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ দু'শো বছরের ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। লাহোর প্রস্তাব সংশোধনীর মাধ্যমে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে পৃথক একাধিক রাষ্ট্রের বদলে পাকিস্তান নামে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফলে আলাদা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূখন্ড নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। এর একটি পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। এদের ব্যবধান ছিল প্রায় দেড় হাজার মাইল। ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, লোকাচার ও জীবন জীবিকার পার্থক্যের কারণে শুধু ধর্মীয় মিলের মাধ্যমে দু'অংশের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠতে পারেনি। শুরং থেকেই তাই পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতমূলত সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পাকিস্তানে কেন্দ্রীয়ভাবে রাজনৈতিক দলের বিকাশের বদলে ১৯৪৭-৫৮ পর্যন্ত পূর্ববাংলা কেন্দ্রিক রাজনৈতিক, যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। এর ফলে কেন্দ্রীয় বনাম প্রাদেশিক রাজনীতির বিকাশ ঘটে। বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের পাশাপাশি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন বিষয়ে উভয় অংশে সংঘাত ঘটে। মুসলিম লীগ সরকার সুষ্ঠু গণতন্ত্র বিকাশে ব্যর্থ হয়, গড়ে তোলে দু'অংশের বিহমশর ব্যবধান। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয়ী হলেও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে কেন্দ্রের শাসন প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্রের বিকাশকে স্তিমিত করা হয়। দীর্ঘ নয় বছর পর ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে সংবিধান রচিত হয়। কিন্তু নামেমাত্র গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় এবং ইস্কান্দার মীর্জার মতো একজন জেনারেলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিযুক্তি, গণতান্ত্রিক সরকার বিরোধী ভূমিকা কেন্দ্র ও প্রদেশে বেসামরিক সরকার ও প্রদেশকে দুর্বল করে দেয়। কেন্দ্র ও প্রদেশে বার বার সরকার পরিবর্তনের মাধ্যমে কার্যত তিনি সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট তৈরি করেন। চূড়ান্তভাবে, ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বাতিল করেন, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করেন এবং পাকিস্তানের ইতিহাসে সামরিক শাসনের সূত্রপাত করেন।

এ ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছে ঃ

- পাঠ-১. বাঙালি ছাত্র, যুব ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭-৫৮)
- পাঠ-২. ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট
- পাঠ-৩. ১৯৫৬ সালের সংবিধান ও পূর্ববাংলায় এর প্রতিক্রিয়া
- পাঠ-৪. ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পটভূমি

পাঠ-১

বাঙালি ছাত্র, যুব ও রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠা (১৯৪৭-৫৮)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *১৯৪৭-৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের গঠন, নীতি ও আদর্শ এবং ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *এ সময় ছাত্র সংগঠনের গঠন ও কর্মকান্ড আলোচনা করতে পারবেন;*
- *যুব সংগঠন ও কর্মকান্ড সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *তৎকালীন রাজনীতিতে ছাত্র, যুব ও রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারবেন।*

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর একদিকে নতুন রাষ্ট্রে বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অনুকূল পরিবেশ পেয়ে অপরদিকে পাকিস্তান রাষ্ট্র কর্তৃক বাঙালিদের শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে এ অঞ্চলে কতগুলো রাজনৈতিক, ছাত্র ও যুব সংগঠন গড়ে ওঠে। এদের মধ্যে আদর্শগত অমিল থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানকেন্দ্রিক দলগুলোর উদ্দেশ্য ছিল গণমানুষের মুক্তি ও অধিকার প্রতিষ্ঠা। এসব দলের মধ্যে কোন একটি ছিল পাকিস্তানের দু'অংশে সক্রিয়, কোন কোনটি পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রিক। উল্লেখ্যযোগ্য দল হচ্ছে মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কে.এস.পি.), নিজাম-ই-ইসলামী, জামায়াতে ইসলামী ও কমিউনিস্ট পার্টি।

ক. ১৯৪৭-৫৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের গঠন, নীতি, আদর্শ ও ভূমিকা

১. মুসলিম লীগ: উপমহাদেশে মুসলমানদের সবচেয়ে পুরাতন রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ। ১৯০৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ হিসেবে এ দলের জন্ম হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ থেকে পাকিস্তান মুসলিম লীগের জন্ম হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নতুন রাষ্ট্রের গভর্নর জেনারেল হওয়ায় চৌধুরী খালেকুজ্জামান পাকিস্তান মুসলিম লীগের সভাপতি পদে আসীন হন। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগকে সংগঠিত করার দায়িত্ব দেয়া হয় মাওলানা আকরাম খাঁর ওপর। ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে তাঁকে সভাপতি এবং ইউসুফ আলী চৌধুরীকে (মোহন মিঞা) সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ গঠিত হয়। এছাড়া ২৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি ওয়ার্কিং কমিটিও গর্বিত হয়।

মুসলিম লীগ মুসলমানদের সংগঠন। ১৮ বছর বা তদুর্ধ পাকিস্তানের যে কোন মুসলমান নাগরিক এর সদস্য হতে পারতো। আদর্শগতভাবে মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বে অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান পৃথক জাতি- এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। তাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও মুসলিম লীগ হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা' বহাল রাখার পক্ষে বেশ কিছুদিন ধরে ছিল। মুসলিম লীগ ছিল ধর্মীয় চেতনাসমৃদ্ধ একটি রক্ষণশীল দল।

ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের একই পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ করে মুসলিম লীগ ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করে। এত বড় অবদান সত্ত্বেও পাকিস্তান আন্দোলনের একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে নিজেকে সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি ভিত্তিক আধুনিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত করতে ব্যর্থ হওয়ায় নতুন রাষ্ট্রে দ্রুত এর আবেদন সীমিত হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে মুসলিম লীগ মূলত পশ্চিম পাকিস্তান কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে এবং পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগকে এর অঙ্গসংগঠন হিসেবেই মূল্যায়ন করতে থাকে। এ অঞ্চলে দলকে সুসংগঠিত করার তেমন কোন গুরুত্বারোপ পরিলক্ষিত হয়নি। বরং ১৯৪৯ সালের জুনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে অভ্যন্তরীণ সংকট খোলাখুলিভাবে দেখা দেয় যা ১৯৫১ সালে আদালত পর্যন্ত গড়ায়। যার পরিণতিতে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ঘটে। মোট কথা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দল হিসেবে মুসলিম লীগের উল্লেখযোগ্য কোন অবদান দৃষ্টিগোচর হয় না। এমনকি, নতুন রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান রচনা করতে দীর্ঘ নয় বছর সময় লাগে। মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে নতুন দল আওয়ামী মুসলিম লীগ ও রিপাবলিকান পার্টি গড়ে ওঠে।

২. আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরে আওয়ামী লীগ): পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী সরকারি দল মুসলিম লীগকে কার্যত সুবিধাভোগী সংগঠন হিসেবে গড়ে তোলেন। লীগে ত্যাগী, পরীক্ষিত নেতা-কর্মীদের কোন স্থান হলো না। সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতি এবং রাজনৈতিক ভিন্ন মতাবলম্বীদের ওপর সরকারি জুলুম-নির্যাতন বিশেষ করে পূর্ববাংলায় প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে। কেন্দ্রীয় নেতাদের বড় অংশ ছিলেন বাংলা ভাষার বিপক্ষে। এমনি এক পরিস্থিতিতে এ অঞ্চলের রাজনীতিবিদগণ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা এবং পূর্ববাংলার স্বার্থ রক্ষার্থে মুসলিম লীগের প্রতিপক্ষ হিসেবে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধিথ করেন এবং তারই পথ ধরে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার কে এম দাস লেনের 'রোজ গার্ডেন'-এ এক রাজনৈতিক কর্মী সম্মেলনে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি, টাঙ্গাইলের শামসুল হককে সাধারণ সম্পাদক, শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক এবং ইয়ার মোহাম্মদ খানকে কোষাধ্যক্ষ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। নবগঠিত দলের ১২ দফা কর্মসূচির মধ্যে স্বায়ত্তশাসন, পূর্ববাংলার প্রাদেশিক নির্বাচন, বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দান ও পাটশিল্প জাতীয়করণ প্রভৃতি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৫৫ সালে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলটিকে একটি অসাম্প্রদায়িক রূপ দেয়া হয়। এর মূল নেতা নির্বাচিত হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

এই দলটির কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থকেন্দ্রিক হওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি গণমানসে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। মূলনীতি কমিটির বিরোধিতা, ভাষা আন্দোলনে সমর্থন ও সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের শরীক দল হিসেবে এ দল মুসলিম লীগের পরাজয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। মূলত আওয়ামী লীগের ভূমিকার কারণেই বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগ বিতাড়িত হয়। ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র

পাওয়ার পর সংখ্যালঘুদের অনেকে এ দলে যোগ দিয়ে এর শক্তি বৃদ্ধি করে। এসব কারণে এদল থেকে প্রভাবশালী নেতা যেমন– ভাসানী, আতাউর রহমান বেরিয়ে গেলেও দলটির শক্তিশালী অবস্থান ছিল।

৩. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ): পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ১৯৫৭ সালে এ নতুন দলটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমসাময়িক আওয়ামী লীগ নেতা এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর সাথে রাজনৈতিক মতবিরোধই এ দল গঠনের প্রধান কারণ। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি তথা পাশ্চাত্য ঘেষা পররাষ্ট্রনীতির কট্টর সমর্থক। অপরদিকে ভাসানী ছিলেন মার্কিন নীতিবিরোধী জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী এবং পূর্ববাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে অনমনীয়। তাই সোহরাওয়ার্দীর সাথে ভাসানীর মতবিরোধ দেখা দেয়। ১৯৫৭ সালের ৭-৮ ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে তা প্রকাশ্য রূপ নেয়। এ বছরই মাওলানা ভাসানী সহ সমমনা ন'জন সদস্য আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি থেকে পদত্যাগ করেন। ২৫-২৬ জুলাই ঢাকার 'রূপমহল সিনেমা হল'-এ নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, খান আবদুল গাফফার খান, জি.এম. সৈয়দ, মাহমুদুল হক ওসমানী প্রমুখ বামপন্থী নেতা উপস্থিত হন। এ সম্মেলনে মাওলানা ভাসানীকে সভাপতি এবং মাহমুদুল হক ওসমানীকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন রাজনৈতিক দল 'ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ' (ন্যাপ) গঠিত হয়। পূর্ববাংলার কিছু সংখ্যক বামপন্থী কর্মীর উদ্যোগে গঠিত 'গণতন্ত্রী দল', পশ্চিম পাকিস্তানের 'ন্যাশনাল পার্টি' সহ আরো কতিপয় দল এতে অন্তর্ভুক্ত হয়। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রতিষ্ঠাকালীন ঘোষণায় পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে বলা হয়: দেশ রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় প্রদেশের কর্তৃত্বে দেয়া হবে। দলের কর্মসূচিতে ভূমি সংস্কার, বিনা খেসারতে জমিদারি উচ্ছেদের অঙ্গীকার করা হয়। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ নীতি প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়। ন্যাপ গঠনের পর বেআইনি ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা-কর্মী এ দলে যোগ দেয়ায় এর শক্তি বৃদ্ধি পায়। পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাপ শক্তিশালী হয়। প্রগতিশীল সংগঠনগুলো এ দলে অন্তর্ভুক্ত হয়।

৪. কৃষক-শ্রমিক পার্টি (কেএসপি)

কৃষক-শ্রমিক পার্টি ছিল ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টির নব সংস্করণ। ব্রিটিশ শাসনকালে অবিভক্ত বাংলায় প্রজা আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯২৯ সালে নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের পূর্বে ফজলুল হকের নেতৃত্বে তা কৃষক-প্রজা পার্টি নামধারণ করে। এ দলের সভাপতি হিসেবে ফজলুল হক ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ পূর্বক পর পর দু' দু'বার কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং নিজে মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। অথচ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে এ দল মাত্র চারটি আসন লাভ করে। এরপর ক্রমশ এ দল নিস্তেজ হয়ে পড়ে এবং দেশ বিভাগের পর এ.কে. ফজলুল হক নিজেকে রাজনীতি থেকে আড়াল করে রাখেন। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে ফজলুল হক রাজনৈতিক অঙ্গনে আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন এবং সারা প্রদেশব্যাপী সফর করে তাঁর অনুসারীদের সংগঠিত করে ১৯৫৩ সালের ২৭ জুলাই 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি' গঠন করেন। নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম

লীগ থেকে কতিপয় নেতা এসে এ নতুন দলে যোগদান করেন। এদের মধ্যে ইউসুফ আলী চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, আবু হোসেন সরকার ও হামিদুল হক চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক অবিভক্ত বাংলার চিফ মিনিস্টার থাকাকালীন কৃষক প্রজার স্বার্থে অনেক অবদান রাখেন। তিনি ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবেরও উত্থাপক ছিলেন। রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময় ভিন্নমুখী অবস্থান গ্রহণ করলেও ফজলুল হক ছিলেন বাংলা ও বাঙালির স্বার্থের প্রতিনিধি। রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকে ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তাঁর নবগঠিত কৃষক-শ্রমিক পার্টিও এ নীতি বা আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেএসপি পূর্ববাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, জনসংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব এবং যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষ নেয়। ফজলুল হক ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। যদিও ১৯৫৮ সালে এসে এ দলটি আবার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

৫. নিজাম-ই-ইসলামী: ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে ১৯৫৩ সালে 'নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি ছিল ইসলামপন্থী দল। এর প্রধান ছিলেন মাওলানা আতাহার আলী। কুমিল্লার আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ছিলেন এর সেক্রেটারি জেনারেল। '৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের অন্যতম শরীক দল হিসেবে নিজাম-ই-ইসলামী থেকে ১৯ জন সদস্য পূর্ববাংলার আইন পরিষদে নির্বাচিত হন। এটি অবশ্য তেমন কোন গণভিত্তিক দল ছিল না। কিন্তু যুক্তফ্রন্টে অন্তর্ভুক্ত থাকায় নির্বাচনে এরূপ সফলতা পেয়েছিল। নির্বাচনের পর এ. কে. ফজলুল হকের মন্ত্রিসভায় এ দল থেকে আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী মন্ত্রী হিসেবে স্থান পান। অচিরেই যুক্তফ্রন্টের প্রধান শরীক দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে ফজলুল হকের মতবিরোধ দেখা দিলে নিজাম-ই-ইসলামী তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেন এবং বেশ কিছুকাল তাঁর সঙ্গে থাকেন। যদিও ভিন্নভাবে কর্মসূচি না দেয়ায় এ দলটি বিশেষ প্রসার লাভ করেনি।

৬. পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি: ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পাকিস্তানে পৃথক পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সে অনুযায়ী একই সালের ৬ মার্চ পাকিস্তানের উভয় অংশের কমিউনিস্ট সদস্যদের এক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাবেক সদস্য সাজ্জাদ জহিরকে সাধারণ সম্পাদক করে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। একই দিন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিগণ একটি পৃথক সম্মেলনে মিলিত হয়ে সুধীন রায় ওরফে খোকা রায়কে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রাদেশিক কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন- মণি সিংহ, বারীণ দত্ত, নেপাল নাগ, মনসুর হাবিব, পূর্ণেন্দু দস্তিদার প্রমুখ।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অনুকরণে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির যাত্রা শুরু হয়। তাই দলীয় নীতি ও আদর্শ একই রূপ থাকে। যেমন- (ক) কমিউনিস্টদের গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক– এ দু'টি বিপ্লব এক সঙ্গে সমাপ্ত করতে হবে, অর্থাৎ বিপ- বের স্তর সমাজতান্ত্রিক। (খ) সংস্কারবাদের পথ পরিত্যাগ করে সশস্ত্র বিপ্লবের পথ অনুসরণ। পূর্ববাংলায় এ দল তেভাগা আন্দোলন, নাচোল, হাজং বিদ্রোহে ভূমিকা রাখে। পাকিস্তান সরকার এ দলের বিরুদ্ধে কঠোর দমননীতি অনুসারণ করে। ১৯৫৪ সালে এ দলটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে এর বহু নেতা ও কর্মী আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট নেতারা

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৫৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয়বার নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। অনেক বুদ্ধিজীবী এ দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় যোগ্য ও ত্যাগী নেতৃত্ব এ দলের মাধ্যমে গড়ে ওঠে।

৭. গণতন্ত্রী দলঃ ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকার আরমানিটোলা ময়দানে বামপন্থী কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে তেভাগা আন্দোলনের প্রখ্যাত কৃষক নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশকে সভাপতি এবং মাহমুদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে 'পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল' গঠিত হয়। পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ছিল মূলত বামপন্থী কর্মীদের একটি সংঘ বা গ্রুপ। এরা র‍্যাডিক্যাল কর্মসূচিতে বিশ্বাসী ছিল। এ দল গঠনের পিছনে কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থন ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের শরীক দল হিসেবে হাজী দানেশ সহ এ দল থেকে কয়েকজন প্রার্থী হন এবং দু'জন বিজয়ী হন।

৮. জামায়াতে ইসলামীঃ ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে ব্রিটিশ ভারতে মাওলানা আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' গঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এর নাম হয় "জমায়াতে ইসলামী পাকিস্তান "। ১৯৫১ সালে এ দলের পূর্ব পাকিস্তান শাখা মাওলানা আবদুর রহিমের নেতৃত্বে গঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে অধ্যাপক গোলাম আজম পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমীর নিযুক্ত হন। জামায়াতে ইসলামী একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। প্রথমে এটি অখন্ড ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হলেও পরে দেশ বিভাগকে মেনে নেয় এবং তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে। এটি গণসংগঠন অপেক্ষা ক্যাডার ভিত্তিক সংগঠনে বিশ্বাসী। কোরান ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন ছিল এ সময়ে এর মূল দাবি। পাকিস্তানের রাজনীতিতে দলটির তৎপরতা প্রথম দশ বছর অপেক্ষা আইয়ুব আমলে অধিকতর সক্রিয় হয়।

৯. পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসঃ অমুসলিমদের মধ্যে পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস ছিল প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান ভুক্ত কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের নিয়ে এ দল গঠিত হয়। নতুন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট হওয়া ছাড়াও কংগ্রেস বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি, যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে সোচ্চার হয়। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে কংগ্রেসই ছিল সরকারিভাবে স্বীকৃত বিরোধী দল। উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সাথে বাংলাকেও পরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবিতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৫২ সালের প্রথম দিকে পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদে এ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৫। এদের মধ্যে কামিনীকুমার দত্ত, বসন্ত কুমার দাস, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মনোরঞ্জন ধর, প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী, ড. প্রতাপচন্দ্র গুহ রায়, রাজকুমার চক্রবর্তী সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১০. গণআজাদী লীগঃ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানভুক্ত পূর্ববাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানস্থ মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এক পক্ষে ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দিন এবং অপর পক্ষে ছিল তাঁর বিরোধী গ্রুপ। দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলায় খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে

মন্ত্রিসভা গঠন নিশ্চিত হলে বিদ্রোহী গ্রুপ একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট দেশ স্বাধীন হবার পূর্বেই (জুলাই মাসে) মুসলিম লীগের বিদ্রোহী গ্রুপ 'গণআজাদী লীগ' নামক একটি দল গঠন করে। এর আহ্বায়ক নিযুক্ত হন কামরুদ্দিন আহমদ। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও ক্রোধের অভিব্যক্তি থেকেই এ সংগঠনের জন্ম। কিন্তু এ সংগঠন বেশিদিন স্থায়ী হতে পারে নি। এর কারণ প্রথমত, আহ্বায়ক কামরুদ্দিন আহমদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা, কারাগার ভীতি ও ত্যাগী মনোভাবের অভাব; দ্বিতীয়ত, সমগ্র দেশে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া; তৃতীয়ত, মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর দমননীতি।

খ. ছাত্র সংগঠনের গঠন ও কর্মকান্ড

১. পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ (পরে ছাত্রলীগ): ১৯৩৫ সালে শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হকের পৃষ্ঠপোষকতায় 'All Bengal Muslim Student Accosiation' নামক একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলায় এ সংগঠনটি বিশেষ ভূমিকা রাখে। মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দলের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে বাংলায় মুসলিম ছাত্রদের সংগঠিত করার উদ্দেশে ১৯৩৭ সালে 'All India Muslim Student Federation' নামে আরও একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলেন। ফলে বাংলার মুসলমান ছাত্ররা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে ১৯৩৮ সালে দু'টি সংগঠনকে একত্রিত করে 'All Bengal Muslim Student League' গঠন করা হয়।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের পর মুসলিম লীগে অন্তর্কলহ শুরু হলে মুসলিম স্টুডেন্ট লীগও দু'গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তন্মধ্যে হাশিম-সোহরাওয়ার্দীর অনুসারীরা ছিল উদারপন্থী; অন্যপক্ষে নাজিমুদ্দিন-আকরাম খাঁর অনুসারীগণ ছিল রক্ষণশীল। উদার গ্রুপ ছিল সরকারবিরোধী আর রক্ষণশীল গ্রুপ ছিল সরকার সমর্থক। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলে পূর্ববাংলায় সরকার বিরোধী গ্রুপ ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি নঈমুদ্দিন আহমদকে আহ্বায়ক করে 'East Pakistan Muslim Student League' গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে ছাত্র সংগঠনটি এ দলের অঙ্গসংগঠনে পরিণত হয়। এ ছাত্র সংগঠনটিকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এর নাম থেকে 'Muslim' শব্দটি বাদ দেওয়া জরুরি ভেবে ১৯৫৩ সালে কাউন্সিলের মাধ্যমে শব্দটি বাদ দিয়ে এর নাম রাখা হয় 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' স্বাধীনতার পরে 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ' নামধারণ করে। উল্লেখ্য যে, ছাত্র সংগঠনটি সকল অবস্থায় 'ছাত্রলীগ' নামেই বেশি পরিচিত।

ছাত্রলীগ শুরু থেকেই একটি উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে গড়ে ওঠে। এ দলের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদের দাবি-দাওয়ার মধ্যে নিজস্ব স্বার্থের পাশাপাশি পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের অধিকার এবং এ অঞ্চলের মানুষের ন্যায্য দাবির প্রতি জোর দিয়েছে ছাত্রলীগের আদর্শে নির্দলীয় থাকার বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও এ উদ্দেশ্য কখনো সফল হয় নি ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা প্রায়ই দলীয় আনুগত্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল।

২. ছাত্র ফেডারেশন: দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলা ছাত্র ফেডারেশনের যে শাখা গঠিত হয় তা গোড়াতেই বেশ দুর্বল ছিল। এই সংগঠনটি কমিউনিস্ট পার্টি সমর্থিত ছিল। এর অধিকাংশ সদস্য ছিল হিন্দু। দেশ বিভাগের পর হিন্দু রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা ব্যাপক হারে ভারতে গমন করায় পার্টি ও ছাত্র ফেডারেশন উভয় সংগঠন এখানে দুর্বল এবং অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাছাড়া সরকারের দমননীতির কারণেও ছাত্র ফেডারেশন এখানে স্থায়ী হতে পারেনি। পরবর্তীকালে ১৯৫২ সালে এ দলের কতিপয় নেতা-কর্মীর উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র ইউনিয়ন গঠিত হলে পূর্বের দলটি নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

৩. পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন: ১৯৫২ সালের ২৬ এপ্রিল 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়। মহান ভাষা আন্দোলনের সময় এ সংগঠনটির জন্ম। সাবেক ছাত্র ফেডারেশনভুক্ত বামপন্থী ছাত্ররাই এ সংগঠন গড়ে তুলেছিল। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ছাত্র ফেডারেশন পাকিস্তান সরকারের দমননীতির প্রধান লক্ষবস্তুতে পরিণত হয়। সরকার ব্যাপক হারে এ দলের নেতা-কর্মীদের নির্যাতন ও জেল হাজতে পাঠাতে থাকলে এ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা সরকারের দৃষ্টি এড়ানোর জন্যই দলের নাম পরিবর্তন করে। এটি ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিবাদী ছাত্র সংগঠন। ১৯৫৭ সালে ন্যাপ গঠিত হলে ছাত্র ইউনিয়ন ন্যাপ-এর রাজনীতিকে সমর্থন করে। তবে এ সংগঠনটি বরাবর নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শানুসর ছিল। ১৯৬৭ সালে ছাত্র ইউনিয়ন আদর্শিক সংঘাতের কারণে দু'টি গ্রুপে বিভক্ত হলে রাজনৈতিক অঙ্গনে এর প্রভাব সীমিত হয়ে পড়ে।

৪. ছাত্র এসোসিয়েশন: দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গসংগঠন হিসেবে 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র এসোসিয়েশন' নামে একটি ছাত্র সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৮ সালের ১৩ জানুয়ারি ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে দলের এ নামকরণ করা হয়েছিল। মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে এ দলের বিকাশ সম্ভবপর হয়নি।

৫. ছাত্রী সংগঠন: কমিউনিস্ট পার্টির অনুপ্রেরণায় এ সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে ইডেন ও কামরুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয়ের একত্রীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র ছাত্র বিক্ষোভ ও আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে এ সংগঠন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। তবে প্রকাশ্যে পাকিস্তানের রাজপথে ছাত্রদের সঙ্গে মিছিল করায় এ সংগঠন তৎকালীন সরকার ও সমাজপতিদের তীব্র কটাক্ষের সম্মুখীন হয়। নেতৃত্বের ধারাবাহিকতা ও নানা প্রতিকূলতার জন্য শেষপর্যন্ত এ সংগঠন তার স্থায়িত্ব সমুন্নত রাখতে পারেনি।

গ. যুব সংগঠন ও কর্মকান্ড

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ (যুবলীগ): ১৯৫১ সালের প্রথম দিকে ছাত্রলীগের নেতা আনোয়ার শহীদ, সোহরাওয়ার্দীর প্রাক্তন প্রাইভেট সেক্রেটারি মাহমুদ নূরুল হুদা, তৎকালীন ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারি আবদুর রউফকে পূর্ববাংলার যুবকদের জন্য একটি নতুন সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন। তখন থেকে এ রকম সংগঠন গড়ার তৎপরতা শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কিছু কিছু

নেতা এ ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। ১৯৫১ সালের ৬ মার্চ ফজলুল হক হলের অ্যাসেম্বলি হলে যুব সম্মেলনের ব্যাপারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন বদিউর রহমান। সভায় যুবলীগের উদ্দেশ্য ইত্যাদি ব্যাখ্যা করেন মোহাম্মদ তোয়াহা। যুবলীগ গঠনের উদ্দেশে যুব সম্মেলনের পরবর্তী তারিখ নির্ধারিত হয় একই বছর ২৭ মার্চ। কিন্তু এদিন সরকার সম্মেলন পন্ড করার লক্ষে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। এ পরিস্থিতিতে স্থান নির্ধারিত হয় বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে জিঞ্জিরায়। সন্ধ্যা ৭টায় সম্মেলন শুরু হয়। তৎকালীন ঢাকার ইংরেজি দৈনিক পাকিস্তান অবজারভার'-এর সম্পাদক আবদুস সালাম সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন নূরুল হুদা। সম্মেলনে যুবলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন মাহমুদ আলী। সভাপতির অভিভাষণের পর নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুস সামাদ একটি খসড়া ম্যানিফেস্টো সম্মেলনে পেশ করেন। সামান্য রদবদলের পর প্রথম অধিবেশনে পেশকৃত খসড়া ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়। যুবলীগের ঘোষণাপত্রের মূলকথা ছিল– (ক) যুদ্ধের বিরোধিতা, (খ) পাকিস্তানকে কমনওয়েলথ ত্যাগ, (গ) জাতি-ধর্ম-বর্ণ-রাজনীতি নির্বিশেষে সকলের চাকরির সমানাধিকার, (ঘ) সার্বজনীন ভোটাধিকার, (ঙ) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু, (চ) যুব সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ, (ছ) জনসাধারণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, (জ) জমিদারী ও জায়গীরদারী প্রথা উচ্ছেদ, (ঝ) শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতকরণ, (ঞ) বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্তকরণ ও বড় বড় শিল্পগুলোর জাতীয়করণ।

ঘ. তৎকালীন রাজনীতিতে ছাত্র, যুব ও রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা মূল্যায়ন

পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ড় জাতীয় রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে মুসলিম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কে.এস.পি. কমিউনিস্ট পার্টি, গণতন্ত্রী দল। আবার ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন ও ছাত্র ইউনিয়নের ভূমিকা ছিল লক্ষণীয়। যুবলীগও তৎকালীন রাজনৈতিক অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ ভারতে মুসলমানদেরকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র আদায়ের আন্দোলনে মুসলিম লীগের অবদান অনস্বীকার্য। দেশ বিভাগোত্তর জাতীয় রাজনীতিতে এ দলের ভূমিকা ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে এবং ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ভরাডুবির পর এ অঞ্চলে মুসলিম লীগের ভূমিকা স্তিমিত হয়ে পড়ে। আওয়ামী মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগ ছিল সমসাময়িককালে পাকিস্তানের প্রধান বিরোধী দল। এ দল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগ ছিল প্রধান শরিক দল। পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনাধিকার আদায়, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবি সহ আপামর বাঙালির স্বার্থ রক্ষায় এ দল সর্বদাই ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। ন্যাপ, কে.এস.পি. ও কমিউনিস্ট পার্টিও সমসাময়িক রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কমিউনিস্ট পার্টি '৫২র ভাষা আন্দোলনে এবং কে.এস.পি. '৫৪-র নির্বাচনে উলে- খ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করে। নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করা এবং নির্বাচনোত্তর মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে কে.এস.পি. অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ন্যাপ ভিন্ন আঙ্গিকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। পূর্ব পাকিস্তানে ঘন ঘন সরকার পরিবর্তনে ন্যাপ প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করে। ন্যাপ মার্কিন ও পাশ্চাত্য ঘেষা পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে সরকারের

তীব্র বিরোধী ছিল। এছাড়া পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙ্গে সেখানকার প্রদেশগুলোকে পূর্বের অবস্থানে নিয়ে আসা এবং যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনে ন্যাপ সর্বদা সোচ্চার ছিল।

ছাত্র সংগঠনের মধ্যে ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র ইউনয়ন '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৫৪-র যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ফেডারেশন (এনএসএফ) ছিল মূলত সরকারের লাঠিয়াল বাহিনী। যুবলীগ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে এবং সমসাময়িক লবণ সংকটের বিরুদ্ধে সরকারে নীতির তীব্র সমালোচনা করে।

১৯৪৭-৫৮ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, পারস্পরিক সংঘাত দেখা গেলেও স্বায়ত্তশাসন, বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ও যুবলীগের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এ সময় দলগুলো নিজেদের সাংগঠনিক ভিত মজবুত করে। রাজনীতি মেরুকরণের ফলে আওয়ামী লীগকে কেন্দ্র করে ধর্মনিরপেক্ষ ধারা এবং মুসলিম লীগকে কেন্দ্র করে ধর্মভিত্তিক ধারা বিকাশ লাভ করে। সরকারের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার দলগুলো পূর্ববঙ্গের জন্য বহু সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রণয়ন, এর মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের উদ্যোগ ও বাংলা ভাষার মর্যাদা দান উলে- খযোগ্য। যদিও ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসনের ফলে তা ব্যাহত হয়।

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সূচনা লগ্নে নতুন রাষ্ট্রে বিবিধ আদর্শের অনুসারী বহুবিধ রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও যুব সংগঠন গড়ে ওঠে। এতে যেমনি ছিল ক্ষমাসীন দলের সমর্থক, তার চেয়ে বেশি ছিল সরকারের নীতি ও আদর্শের বিরোধী দল। দলগুলো কখনো পৃথকভাবে আবার কখনো যৌথভাবে ('৫৪ সালে) ক্ষমতাসীন দলকে মোকাবেলা করে এবং নির্বাচনে পর্যুদস্ত করে। তাই ক্ষমতাসীন দল প্রথমাবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে উদারনীতি অনুসরণ করলেও পর্যায়ক্রমে নিজেদের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ উপলব্ধি করতে পেরে ১৯৫৭ সালে রাজনৈতিক দলগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করে এবং সাথে সাথে ঐসব দলের নেতা-কর্মীদের কারাগারে নিক্ষেপ করে নিজেদের শাসন পাকাপোক্ত করার প্রয়াস নেয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৫।
২। ড. মোঃ মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ঃ ১৯৪৭-৭১*, ঢাকা, সময় প্রকাশনী, ১৯৯৯।
৩। আবুল কাশেম (সম্পাদনা), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও আওয়ামী লীগ ঐতিহাসিক দলিল*, ঢাকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১।
৪। নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস', প্রফেসর সালাহ্উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন–
(ক) শেখ মুজিবুর রহমান (খ) এ. কে. ফজলুল হক
(গ) সোহরাওয়ার্দী (ঘ) মাওলানা ভাসানী।

২। আওয়ামী মুসলিম লীগকে আওয়ামী লীগ নামকরণ করা হয়–
(ক) ১৯৫৩ সালে (খ) ১৯৫৪ সালে
(গ) ১৯৫৫ সালে (ঘ) ১৯৫৬ সালে।

৩। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হয়–
(ক) ১৯৫৬ সালে (খ) ১৯৫৭ সালে
(গ) ১৯৫৮৯ সালে (ঘ) ১৯৫৯ সালে।

৪। কৃষক-শ্রমিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন–
(ক) সোহরাওয়ার্দী (খ) আতাউর রহমান খান
(গ) মাওলানা ভাসানী (ঘ) ফজলুল হক।

৫। নিজাম-ই-ইসলামী দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন–
(ক) মাওলানা মওদুদী (খ) মাওলানা আতাহার আলী
(গ) মোহন মিঞা (ঘ) আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী।

৬। পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন–
(ক) মণি সিং (খ) বারীণ দত্ত
(গ) পূর্ণেন্দু দস্তিদার (ঘ) খোকা রায়।

৭। জামায়াতে ইসলামীর পূর্বের নাম ছিল–
(ক) নিজাম-ই-ইসলাম (খ) ভারতীয় জামায়াতে ইসলামী
(গ) জামায়াতে ইসলামী হিন্দ (ঘ) কোনটিই নয়।

৮। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রথম 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' নামে পরিচিত হয়–
(ক) ১৯৫২ সালে (খ) ১৯৫৩ সালে
(গ) ১৯৫৪ সালে (ঘ) ১৯৫৫ সালে।

৯। ছাত্র ইউনিয়নের পূর্বের নাম ছিল–
(ক) ছাত্রলীগ (খ) ছাত্র ফেডারেশন
(গ) গণতান্ত্রিক ছাত্রদল (ঘ) মুসলিম ছাত্র ইউনিয়ন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। মুসলিম লীগের গঠন, বিকাশ ও কর্মসূচি (১৯৪৭-৫৮) সংক্ষেপে লিখুন।
২। আওয়ামী লীগের গঠন, বিকাশ ও কর্মসূচি (১৯৪৯-৫৮) বর্ণনা করুন।
৩। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের গঠন ও কর্মসূচি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ১৯৪৭-৫৮ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের গঠন ও নীতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। তৎকালীন রাজনীতিতে দলগুলোর ভূমিকা মূল্যায়ন করুন।

পাঠ-২

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি–

- *১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পটভূমি জানতে পারবেন;*
- *মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন ও এর কর্মসূচির বর্ণনা দিতে পারবেন;*
- *১৯৫৪ সালের নির্বাচনের বিভিন্ন ইস্যু ও প্রচার কৌশল আলোচনা করতে পারবেন;*
- *নির্বাচনের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *নির্বাচনের গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারবেন;*
- *মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;*
- *যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ নির্ণয় করতে পারবেন;*
- *কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল এবং*
- *পূর্ববাংলায় এর প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করতে পারবেন।*

পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন ছিল ব্যালট বিপ্লব। যদিও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। যদিও এটি ব্যর্থ হয় কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য স্ব-স্ব জনসমর্থন যাচাইয়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে পরবর্তীকালে এ নির্বাচন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

ক. নির্বাচনের পটভূমি

পাকিস্তানের জন্মের কয়েক বছরের মধ্যেই জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক উপদলসমূহের মধ্যকার ভাষা ও আঞ্চলিক রাজনীতি, স্বাধিকারের প্রশ্নে অব্যাহত মতানৈক্য এবং দ্বন্দ্ব দেশটিতে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন আবশ্যক করে তোলে। তারই পথ ধরে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, নিজাম-ই-ইসলামী, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানিদের ওপর জোরপূর্বক উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেয়া সহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ক্রমবর্ধমান বৈষম্যনীতি ও নিপীড়ন পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ও জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করে।

১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ক্ষমতাসীন দল নানা অজুহাতে নির্বাচন বিলম্বিত করতে থাকে। ১৯৪৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইল উপনির্বাচনে সরকার দলীয় প্রার্থীর চরম ভরাডুবি সরকারকে ভবিষ্যৎ নির্বাচনের বিষয়ে আরো সন্দিহান করে তোলে। আইন পরিষদের ৩৪টি শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়। এসব ঘটনা এ অঞ্চলের রাজনৈতিক দলগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হতে উৎসাহিত করে। অবশেষে সরকার ১৯৫৩ সালে ভারত শাসন আইনের নির্বাচন সংক্রান্ত ধারায় কিছুটা সংশোধন করে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের দিন ধার্য করে।

খ. যুক্তফ্রন্ট গঠন ও এর কর্মসূচি

নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগকে চরম শিক্ষা দেয়ার লক্ষে এ অঞ্চলের কয়েকটি সমমনা দল জোট গঠন করে। ১৯৫৩ সালে আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এগুলো হলো– মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মাওলানা আতাহার আলীর নেতৃত্বাধীন নিজাম-ই-ইসলামী এবং হাজী দানেশের নেতৃত্বাধীন বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রতীক হিসেবে বেছে নেয় 'নৌকা' এবং 'বাংলা'কে রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারের দাবিসহ ২১ দফাভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করে। নির্বাচনের প্রাক্কালে বাঙালির জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সমাজের সর্বস্তরের ভোটারদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা সম্বলিত এমনই একটি বিস্তৃত কর্মসূচি গ্রহণ করে। এটি রচনায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন আবুল মনসুর আহমদ। এই ২১ দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ–

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিতকরণ এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ।

৩. পাট শিল্প জাতীয়করণ। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলে পাট সংক্রান্ত কেলেঙ্কারির তদন্ত ও শাস্তি বিধান।

৪. কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন।

৫. লবণ তৈরির কারখানা স্থাপন। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলে লবণ কেলেঙ্কারির তদন্ত ও শাস্তি বিধান।

৬. শিল্প-কারিগর শ্রেণীর মোহাজেরদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে দেশকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা করা।

৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা। আই.এল.ও'র মূলনীতি অনুযায়ী শ্রমিকদের সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত করা।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন।

১০. কেবল মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা। সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করে একই পর্যায়ভুক্ত করা। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি কালাকানুন বাতিল ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ব্যবস্থা।

১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা। বেতনভোগীদের বেতনের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। মন্ত্রীর বেতন এক হাজারের বেশি না হওয়া।

১৩. ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার লক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন রদ। বিনা বিচারে আটক বন্দিদের মুক্তি দেওয়া। সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করার অধিকার নিশ্চিত করা।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা।

১৬. পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'কে আপাতত ছাত্রাবাস ও পরে 'বাংলার ভাষার গবেষণাগারে' (বর্তমানে এটি বাংলা একাডেমি) পরিণত করা।

১৭. '৫২-এর ভাষা শহীদদের স্মরণে শহীদ মিনার নির্মাণ।

১৮. ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা।

১৯. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ববাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যাতীত আর সবকিছু পূর্ববাংলার সরকারের হাতে ন্যস্ত করা। আত্মরক্ষার স্বার্থে পূর্ববাংলায় অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থানান্তর।

২০. যুক্তফ্রন্টের সরকার কোনো অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

২১. আইন পরিষদের কোনো আসন শূন্য হলে, তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তা পূরণ।

গ. প্রধান নির্বাচনী ইস্যু ও প্রচার কৌশল

নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট পূর্ববাংলার শিক্ষক, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক তথা আপামর জনসাধারণের ভাবাবেগের প্রতি লক্ষ রেখে কর্মসূচি গ্রহণ করে। নির্বাচনী ইস্যু হিসেবে ফ্রন্ট 'বাংলাকে' রাষ্ট্রভাষার দাবি এবং পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনাধিকারকে প্রাধান্য দেয়। তাছাড়া ফ্রন্ট আঞ্চলিক বৈষম্য ও শোষণের নীতি ও শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, পাটশিল্প জাতীয়করণ, সমবায় ও ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সাহায্য ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসে। অপরদিকে মুসলিম লীগ গণমুখী কোন ইস্যু তুলে ধরতে পারেনি। ভোটারদের কাছে মুসলিম লীগের একমাত্র বক্তব্য ছিল, তারা ইসলামিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। লীগের নির্বাচনী শ্লোগান ছিল দু'টি। একটি 'ইসলাম বিপন্ন', দ্বিতীয়টি 'পাকিস্তান বিপন্ন'। মুসলিম লীগের নির্বাচনী প্রচারণায় পূর্ববাংলার জনগণের মৌলিক সমস্যা ও প্রয়োজন উপেক্ষিত হয়। এর ফলে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছাতে এ দলটি ব্যর্থ হয়। উপরন্তু, যুক্তফ্রন্ট সমসাময়িক লবণ সংকটের বিষয়টি সামনে নিয়ে আসে এবং সরকারকে ঘায়েল করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে যা সরকারকে 'গণবিরোধী', দুর্নীতিপরায়ণ' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় ফেলে দেয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে যে যুবক, ছাত্র তরুণরা মুসলিম লীগের পক্ষে কাজ করে তারাই যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে এ অঞ্চলের গণজোয়ার সৃষ্টি করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসমর্থন আদায়ের জন্য সুদূর লোকালয়ে

কাজ করে। পূর্ববাংলার খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ মাওলানা ভাসানী, আবুল মনসুর আহমদ, শেখ মুজিব, আতাউর রহমান, ফজলুল হক এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে গিয়ে প্রচারাভিযান চালান।

ঘ. নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে (আওয়ামী লীগ এককভাবে ১৪৩টি) জয়ী হয় এবং প্রদত্ত ভোটের ৬৪% লাভ করে। সরকারি দল মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন যা প্রদত্ত ভোটের ২৭% মাত্র। বাকি ৫টি মুসলিম আসনের ৪টি পায় স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এবং ১টি পায় খেলাফত-ই-রব্বানী পার্টি। এছাড়া মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনের সবকটিই যুক্তফ্রন্ট লাভ করে। নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী যুক্তফ্রন্ট প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের যোগ্যতা অর্জন করে।

ঙ. নির্বাচনের গুরুত্ব

প্রথমত, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পূর্ববাংলার সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত প্রথম অবাধ নির্বাচন। এই নির্বাচনের গুরুত্ব অপরিসীম। এ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে ব্যালটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এ অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা ও তাদের গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি গভীরভাবে আলোকপাত করে এবং বাঙালি জাতির ঐক্যবোধকে আরো প্রগাঢ় করে তোলে। নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ক্ষমতাসীন দলের বহু প্রভাবশালী নেতা, এমনকি মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন যুক্তফ্রন্টের তরুণ নেতা খালেক নেওয়াজ খানের কাছে পরাজিত হন। শিক্ষামন্ত্রী সৈয়দ আবদুস সালাম, মোনায়েম খান, খান এ. সবুর, সৈয়দ আফজাল, গমির উদ্দিন প্রধান বিপুল ভোটে পরাজিত হন। নির্বাচনের মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহার ছিল এ অঞ্চলের গণমানুষের প্রাণের দাবি এবং এ অঞ্চলের নেতারাই ভবিষ্যত নেতৃত্বের বৈধ দাবিদার। তাছাড়া এ নির্বাচনে আওয়ামী মুসলিম লীগ এককভাবে সর্বাধিক আসনে জয়ী হওয়াতে এই দল ও দলীয় নেতৃবৃন্দের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়ে যায়। নির্বাচনের ফলাফল এটাই প্রমাণ করে যে, পূর্ববাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্বার্থ পশ্চিম পাকিস্তান হতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং এ অঞ্চলের নেতৃবর্গই এদের স্বার্থ সংরক্ষণে সক্ষম। সর্বোপরি, এ নির্বাচনের ফলাফলের মধ্যে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের পুন:প্রতিফলন (দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র) ঘটে। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্যদিয়ে পূর্ববাংলায় যে ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে তা পরবর্তী জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে।

দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচন ও ফলাফলের মাধ্যমে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়। বিভাগ পূর্ববর্তী রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রভাবের স্থলে ১৯৫৪ সাল থেকে ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সূচনা ঘটে। ইসলাম রক্ষা ও পাকিস্তান রক্ষার দোহাই দিয়ে বাঙালিকে শোষণের দিন শেষ হয়। নির্বাচনী কর্মসূচি বাঙালির বঞ্চনা ও শোষণের বিভিন্ন দিক পরিস্ফুটিত করে যা পরবর্তী সময়ে জাতীয় রাজনীতিতে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে চাঙ্গা করে তোলে।

তৃতীয়ত, পূর্ববঙ্গের জনগণের স্বার্থে দলগুলোর জোট গঠনের ফলে রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে আদর্শগত অমিল সত্ত্বেও বৃহত্তর স্বার্থে ঐকমত্য পোষণ পরবর্তীকালে আন্দোলনের বিজয়কে নিশ্চিত করে।

চতুর্থত, কৌশলগত কারণে কমিউনিস্টরা তাদের দলীয় প্রার্থী হওয়ার পরিবর্তে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেয় এবং ১৫টি আসন লাভ করে। এছাড়া কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের ৯জন সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। এরা সকলে ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের মনোনীত। পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ এদেশের রাজনীতিতে প্রধান দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের মূলে রাজনীতির এই মেরুকরণের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। '৫৪ সালের পর সরকার বিরোধী কর্মসূচিসহ সকল আন্দোলনে ধর্মভিত্তিক দল বনাম ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো স্বতন্ত্রভাবে অংশ নেয়। যুক্তফ্রন্টের সবচেয়ে বড় দল আওয়ামী লীগ ১৯৫৫ সালে দলের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

পঞ্চমত, এই নির্বাচনের আরো একটি উল্লেখ্যযোগ্য ফল হলো পূর্ববাংলার জাতীয় রাজনীতির চরিত্র পরিবর্তিত হয়। পূর্ববাংলায় এতোদিন এলিট শ্রেণী ও ভূস্বামীদের যে একক কর্তৃত্ব ছিল তা এ নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষিত এলিট গোষ্ঠী, আইনজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষক ও ব্যবসায়ীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। নির্বাচিতদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ছিলেন তরুণ। এদের অনেকে পরবর্তীকালে স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে রাজনীতিতে অসামান্য অবদান রাখেন।

ষষ্ঠত, এই নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্ব সম্পর্কে বাঙালির মোহমুক্তি ঘটে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গবাসীরা পুনরায় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রায় দেয়। মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবি ও জনগণ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়। মুসলিম লীগ আর কখনো জনসমর্থন পায়নি। ফলে এটি একটি কাগুজে দলে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে এটি বহুধা বিভক্ত হয় এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

চ. মন্ত্রিসভা গঠন

নির্বাচনোত্তর যুক্তফ্রন্টের সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচনের পূর্বেই পূর্ববাংলার গভর্নর চৌধুরী খালেকুজ্জামান ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আমন্ত্রণ জানান। ফ্রন্টের অন্যতম নেতা সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে নিয়োজিত থাকায় এ.কে. ফজলুল হক ৪ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অর্থ, স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব বিভাগের দায়িত্বে থাকেন; আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার বিভাগের; আশরাফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী বেসামরিক সরবরাহ ও যোগাযোগ বিভাগের এবং সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা, বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন।

ছ. যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের পেছনে কতগুলো বিষয় প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল-

১. যুক্তফ্রন্ট গঠন: ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে মধ্যপন্থী, বামপন্থী, ইসলামপন্থী নির্বিশেষে পূর্ববাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ছিল একটি শক্তিশালী জোট যা বিজয়ের পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল।

২. যুক্তফ্রন্টের কর্মসূচি: যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারের মধ্যে পূর্ববাংলার এলিট শ্রেণী থেকে সাধারণ কৃষক-শ্রমিক সকলের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছিল যা জনগণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিশ্রুতি, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দ্রব্যমূল্য হ্রাস কর্মসূচি জনমনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অথচ মুসলিম লীগ স্বয়ত্তশাসন, বাংলাভাষা বিরোধী ভাবমূর্তি গড়ে তোলে। মুসলিম লীগের মুখপত্র দৈনিক আজাদ যথার্থই এ দলের পরাজয়ের জন্য বাংলাভাষা প্রশ্নকে সঠিকভাবে মোকাবেলা না করা, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতি অবহেলা, পূর্ববাংলার অর্থনৈতিক দুর্গতি, সাধারণ জনগণ থেকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের বিচ্ছিন্নতাকে দায়ী করে। সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি ও সুদৃঢ় সংগঠনের অভাব দলটিকে কঠিন অবস্থার মুখোমুখি করে। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন দোষ-ত্রুটি জনসম্মুখে জোরালোভাবে প্রচার করেছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ জোটের বিরুদ্ধে তেমন কোনো জনপ্রিয় ইস্যু প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

৩. নেতৃত্ব: যুক্তফ্রন্টের জয়ের তিন নৃপতি ছিলেন এ.কে. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা ভাসানী। এসব নেতৃবৃন্দ ছাড়াও বয়সে তরুণ নেতা ও ছাত্রনেতারা ছিল দলের বড় শক্তি। তরুণ ছাত্ররা এ দলের জয়ের জন্য ভূমিকা রাখেন। অপরপক্ষে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এ অঞ্চলে কখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। এদের বড় অংশ ছিলেন ধর্মান্ধ, গণবিচ্ছিন্ন, শহুরে এলিটভুক্ত। গ্রামীণ পর্যায়ে ১৯৫৪ সালে এ দলের ভিত ছিল দুর্বল। দলটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-সদস্য নির্ভর হয়ে পড়ে।

জ. কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ ও যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার শুরু থেকেই মন্ত্রীত্ব নিয়ে শরিক দলগুলোর মধ্যে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় যা ছিল যুক্তফ্রন্ট সরকারের চরম দুর্বলতা। মন্ত্রিসভা গঠনের কিছুদিন পর মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক কলকাতা সফরে যান এবং সেখানে দুই বাংলার অধিবাসী ও তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি নিয়ে এক আবেগপ্রবণ ভাষণ দেন যা ক্ষমতাসীন সরকারকে ক্ষেপিয়ে তোলে। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ২১ ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন এবং পূর্ববর্তী মুসলিম লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 'বর্ধমান হাউজ'কে ভাষা আন্দোলনের স্মারক গবেষণাগার ঘোষণা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হয়। এ সময় দু'টি ঘটনা হক মন্ত্রিসভাকে চরম বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। সেগুলো হল– ২ মে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের সম্মুখে জেল কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় মহল-াবাসীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং ১৫ মে আদমজী পাটকলে বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষকে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারের দুর্বলতা বলে আখ্যায়িত করে। সর্বশেষ, 'নিউ ইয়র্ক টাইমস্' পত্রিকার সংবাদদাতা কালাহানকে দেওয়া ফজলুল হকের তথাকথিত সাক্ষাতকার কেন্দ্রীয় সরকারকে বিচলিত করে তোলে। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ফজলুল হক পূর্ববাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হক নানা চেষ্টা করেও কেন্দ্রীয় সরকারকে বোঝাতে ব্যর্থ হন। কেন্দ্রীয় সরকার '৫৪ সালের ৩০মে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বরখাস্ত এবং

পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন ঘোষণা করেন। এভাবে মাত্র ৫৬ দিনের মাথায় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান ঘটে।

ঝ. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল ও পূর্ববাংলায় প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তান সরকার যুক্তফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের গণহারে গ্রেফতার শুরু করে। সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফজলুল হককে গৃহে অন্তরীণ রাখা হয়, মাওলানা ভাসানীর স্বদেশে প্রবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়, শেখ মুজিব সহ বহু তরুণ নেতাকে গ্রেফতার করা হয় এবং যুক্তফ্রন্ট অফিসে তালা লাগানো হয়। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পূর্ববাংলায় চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ফ্রন্ট কর্মীরা অফিসে মিটিং করতে ব্যর্থ হয়ে ফ্রন্ট নেতা আবু হোসেন সরকারের বাসভবনে মিটিং আহ্বান করে। সভায় নেতৃবর্গ মন্ত্রিসভা বাতিল এবং সরকারের গণহারে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রয়োজনে একযোগে কারাবরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু ফজলুল হক এ সিদ্ধান্ত পরিহার করে নেতৃবৃন্দকে গ্রামে গিয়ে বিপ্লবী ও ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দেন। তাতে কোন ফল হয়নি। একদিকে ফজলুল হকের অনীহা এবং ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর অনুপস্থিতি, অপরদিকে সরকারের কঠোর দমননীতির মুখে যুক্তফ্রন্টের আন্দোলন শেষপর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের রায়কে উপেক্ষা করে অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালুর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলায় আন্দোলন থেমে যায়নি। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয়ে, এতে পূর্ববাংলার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। সংবিধান রচনার পেছনে এ.কে. ফজলুল হক, সোহরাওয়ার্দী, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই শাসনতন্ত্রে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার কিছু কিছু বিষয় যেমন- স্বায়ত্তশাসন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার মর্যাদা দাবি অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তীকালে স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনে, ১৯৭১ সালে ৭ মার্চ শেখ মুজিবের বক্তৃতায় যুক্তফ্রন্টের প্রতি অবিচার ও সরকারি বৈরীনীতি বারবার উল্লেখ করা হয়।

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা আপাতত দৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। কেন্দ্রের স্বৈরাচারী ক্ষমতাবলে মন্ত্রিসভা বাতিল ও সরকার বিরোধী আন্দোলনকে আপাতত দমন করা সক্ষম হলেও নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতির মধ্যে যে চেতনা ও ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল তা স্তিমিত করতে পারেনি। ষাটের দশকে কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী আন্দোলনে বাঙালিদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে তা প্রতীয়মান হয়।

সারসংক্ষেপ

পূর্ববাংলার মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বাঙালি জাতি, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি এবং বাঙালির ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের কার্যকলাপ ও পাকিস্তানি শাসকদের ছয় বছরের শোষণের বিরুদ্ধে এই নির্বাচন ছিল ব্যালট বিপ্লব। যদিও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। যদিও এটি ব্যর্থ হয় কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচন রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য স্ব-স্ব জনসমর্থন যাচাইয়ের একটি সুযোগ সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের জাতীয় রাজনীতিতে পরবর্তীকালে এ নির্বাচন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধঃ দলিলপত্র*, ১ম খন্ড, ঢাকা, তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩।

২। কামালউদ্দিন আহমেদ, 'চুয়ান্ন সালের নির্বাচনঃ স্বায়ত্তশাসন প্রসঙ্গ', সিরাজুল ইসলাম সম্পাদিত, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪–১৯৭১*, প্রথম খন্ড, ঢাকা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৩।

৩। নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৫৮', সালাহ্উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়–

(ক) ৭ মার্চ (খ) ৮ মার্চ

(গ) ১৮ মার্চ (ঘ) ১৯ মার্চ।

২। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের সংখ্যা–

(ক) ৪টি (খ) ৫টি

(গ) ৬টি (ঘ) ৭টি।

৩। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার প্রথম দাবি ছিল–

(ক) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (খ) পাট শিল্প জাতীয়করণ

(গ) ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা (ঘ) বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেয়া।

৪। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পায়–

(ক) ৭টি আসন (খ) ৯টি আসন

(গ) ১১টি আসন (ঘ) ১৯টি আসন।

৫। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আসন পায়–

(ক) কৃষক-শ্রমিক পার্টি (খ) নিজাম-ই-ইসলামী

(গ) আওয়ামী মুসলিম লীগ (ঘ) গণতন্ত্রী পার্টি।

৬। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন–

(ক) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (খ) মাওলানা ভাসানী

(গ) আতাউর রহমান খান (ঘ) এ. কে. ফজলুল হক।

৭। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় ছিল–

(ক) ৫০ দিন (খ) ৫৩ দিন

(গ) ৫৬ দিন (ঘ) ৫৮ দিন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি সংক্ষেপে লিখুন।

২। ১৯৫৫ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্যু ও প্রচার কৌশল লিখুন।

৩। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও এর ফলাফল সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর গুরুত্ব নির্ণয় করুন।

২। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের সরকার গঠন, বাতিল ও বাতিলের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে একটি নিবন্ধ লিখুন। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পেছনে আপনি কি কারণ চিহ্নিত করবেন?

পাঠ-৩

১৯৫৬ সালের সংবিধান ও পূর্ববাংলায় এর প্রতিক্রিয়া

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *১৯৫৬ সালের সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট আলোচনা করতে পারবেন;*
- *এই সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;*
- *সংবিধানের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;*
- *পূর্ববাংলায় এর প্রতিক্রিয়া পর্যালোচনা করতে পারবেন।*

ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর একটি গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপরিষদের ওপর দায়িত্ব ছিল পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের। কিন্তু গোড়া থেকে পাকিস্তানে যে ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এলিট শ্রেণীর যেকোন প্রকারে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার যে প্রবণতা লক্ষ করা যায় তাতে করে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিলম্বিতই হতে থাকে। বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি অতিক্রম করে অবশেষে ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে গণপরিষদের প্রণীত সংবিধান কার্যকর হয়। এটি পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান। যদিও এই সংবিধান ছিল সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার পক্ষে। প্রকৃতপক্ষে সংবিধানটি পাকিস্তানিদের অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হলেও পাকিস্তান এর কতটা ধারণ করতে পেরেছিল তাতে সন্দেহ আছে। বিশেষকরে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলার মানুষদের হতাশ হবার অনেক কারণ ছিল। বৃহৎ আকারের সংবিধানটির সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে অনেক অসঙ্গতি ধরা পড়ে।

ক. সংবিধান রচনার প্রেক্ষাপট

পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর হতে বিভিন্ন পর্যায় থেকে দ্রুত একটি সংবিধান প্রণয়নের বিষয়ে চাপ ছিল। বিশেষ করে পূর্ববাংলার পক্ষ থেকে সংবিধান প্রণয়নের জোরালো দাবি ওঠে। স্বাধীনতার পর ক্রমেই এটা স্পষ্ট হচ্ছিল যে পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণী এমন একটি শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন চাইছে যাতে পাকিস্তান কাঠামোর ভেতর পূর্ববাংলা কার্যত একটি উপনিবেশে পরিণত হয়। পূর্ববাংলার সুশীল সমাজ এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব পরিস্থিতি অনুধাবন করে প্রতিবাদে সোচ্চার হন।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৯ জন। এর ভেতর পূর্ববাংলার ৪৪ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ২৫ জন। পূর্ববাংলার ৪৪ জন সদস্যের ভেতর ৩১ জন মুসলিম সদস্য এবং ১৩ জন সাধারণ সদস্য। পশ্চিম পাকিস্তানে এ সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ জন এবং ৬ জন। যার ভেতর ২ জন শিখ সদস্য ছিলেন। তবে প্রকৃতপক্ষে পূর্ববাংলার ৪৪ জন গণপরিষদ সদস্যের ভেতর পশ্চিম পাকিস্তানের ৬ জন

রাজনৈতিক নেতা এদেশীয়দের উদারতার সুযোগে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফলে পূর্ববাংলার সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন ৩৮ জন। পরবর্তী সময় সরকার গণপরিষদে আরো ১০ জন সদস্য বৃদ্ধি করেন। এই ১০ জনই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত হন। ফলে অবস্থা দাঁড়ায় পূর্ববাংলার সদস্য সংখ্যা ৪৪ জন (বাস্তবে ৩৮ জন) এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৩৫ জন (বাস্তবে ৪১ জন)। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনিহার মুখে গণপরিষদ বিশেষ কাজ করতে পারেনি। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত তারা মোট ১৬ বার অর্থাৎ বছরে গড়ে মাত্র ২ বার অধিবেশনে মিলিত হতে পেরেছে। মোট কার্যদিবস ছিল মাত্র ১২১ দিন। উল্লেখিত ৮ বছরে ৫৬ ভাগ জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ববাংলায় গণপরিষদের কোন অধিবেশনে বসেনি।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান গণপরিষদ শাসনতন্ত্র মূলনীতি কমিটি গঠন করে। মূলনীতি কমিটিতে পূর্ববাংলার প্রতিনিধি ছিল খুবই নগন্য সংখ্যক। পূর্বেই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের একটি দিক নির্দেশনামূলক প্রস্তাব পাকিস্তান গণপরিষদে গৃহীত হয়। ১৯৪৯ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মূলনীতি কমিটি দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্টের নির্দেশনা দিয়ে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। এতে নিম্নকক্ষের সদস্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারণের কথা বলা হলেও উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রদেশের সমান প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয়। এতে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলা হয়। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুলনীতি কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের আওয়ামী লীগ অন্যান্য দলের সঙ্গে ঢাকায় একটি মহাসম্মেলন করে এবং সেখান থেকে ব্যাপক আলোচনার পর শাসনতন্ত্রের জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। এখানে ৭৮টি ধারার মাধ্যমে বিকল্প একটি প্রস্তাব দেয়া হয়। ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমুদ্দিন মূলনীতি কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট পেশ করেন। এতে ৪০০ সদস্যের ফেডারেল পার্লামেন্ট এবং ১২০ সদস্যের প্রাদেশিক পরিষদের কথা বলা হয়। এবারও ভাষার প্রশ্নটি অমীমাংসিত রয়ে যায়। ১৯৫৩ সালের অক্টোবর মাসে গণপরিষদ মূলনীতি কমিটি তৃতীয় রিপোর্ট পেশ করে। এতে দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার প্রস্তাব করা হয় বলা হয়, উচ্চ পরিষদ গঠিত হবে। ৩০০ জন সদস্য নিয়ে যার ভেতর পূর্ববাংলার সদস্য হবেন ১৬৫ জন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর গণপরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল দেশে জরুরী অবস্থা জারি করেন।

১৯৫৪ সালের ভেতর পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ববাংলার ইতিহাসের দু'টি অত্যন্ত উল্লেখ করার মত ঘটনা ঘটে। প্রথমত, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং দ্বিতীয়ত, ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের ভরাডুবি। এসবই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর জন্য অশনি সংকেত। ফলে ক্ষমতাসীন পশ্চিম পাকিস্তানি এলিটগোষ্ঠী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে পরিস্থিতি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার অপতৎপরতা শুরু করে।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে অধ্যাদেশের মাধ্যমে প্রাপ্তক্ষমতাবলে পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। অধ্যাদেশ অনুসারে পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তান দু'অংশ থেকে ৪০ জন করে গণপরিষদ সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হয়। নির্বাচনের পদ্ধতি ছিল পরোক্ষ। ৮০ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হবার পর ১৯৫৫ সালের ৭ জুলাই মারীতে গণপরিষদের অধিবেশন বসে। পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববাংলার রাজনৈতিক নেতারা মারীতে একটি ৫ দফা সমঝোতায় উপনীত হন। এই সমঝোতার ভিত্তিতেই ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হয়।

খ. ১৯৫৬ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৫৬ সাল পাকিস্তানের জন্য যে সংবিধান প্রণীত এবং গৃহীত হয় তার মূল সুর বোঝানোর জন্য একটি প্রস্তাবনা লিখিতভাবে যুক্ত করা হয়েছিল। এই সংবিধানে ৬টি তপসিল, ১৩টি অনুচ্ছেদ এবং ২৩৪টি ধারা ছিল। এর প্রধান যে বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করার মত তা' হলো-

১. ইসলামী প্রজাতন্ত্র: '৫৬ সালের সংবিধান অনুসারে পাকিস্তানকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হয়। কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন নিষিদ্ধ হয় এবং রাষ্ট্রপতি মুসলমান হবেন- এ শর্ত যুক্ত করা হয়।

২. যুক্তরাষ্ট্র: পাকিস্তান হবে একটি যুক্তরাষ্ট্র এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের ভেতর ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়। ক্ষমতার ক্ষেত্রে তিনটি ভাগ দেখা যায়- একটি কেন্দ্রীয় সরকারের, একটি প্রাদেশিক সরকারের এবং একটি ছিল যুগ্ম তালিকাভুক্ত।

৩. সংসদীয় সরকার: কেন্দ্রে এবং প্রদেশে সংসদীয় প্রকৃতির বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক প্রধানে পরিণত করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী ছিলেন।

৪. এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা: পাকিস্তানে গোড়া থেকেই যদিও দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা নিয়ে আলোচনা চলছিল, শেষপর্যন্ত দেশে এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হয়। ১০ জন মহিলা সদস্য সহ মোট ৩১০ সদস্যের পার্লামেন্ট গঠনের কথা বলা হয়। সংখ্যাসাম্য নীতির ভিত্তিতে এই আসন বন্টন করা হয়।

৫. রাষ্ট্রভাষা: বাংলা এবং উর্দু উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।

৬. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন: ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছে। সংবিধানে পরিষ্কার ভাষায় প্রাদেশিক কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছিল। প্রদেশ পরিচালনার জন্য প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ, আইন পরিষদ প্রভৃতির বিষয়ে স্পষ্ট বিধান ছিল।

৭. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করার কথা বলা হয়। একই সঙ্গে বিচার বিভাগকে সংবিধানের রক্ষকের দায়িত্বও দেয়া হয়। একটি সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রদেশগুলির জন্য আলাদা হাইকোর্টের বিধান রাখা হয়।

৮. মৌলিক অধিকার: সংবিধানে নাগরিকদের জন্য মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। মৌলিক অধিকারসমূহ বিধিবদ্ধ করে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা এবং এর জন্য আদালতের দ্বারস্থ হবার সুযোগ তৈরি করে দেয়া হয়।

৯. স্বাধীন নির্বাচন কমিশন: পাকিস্তান যেহেতু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার দ্বারা শাসিত হবে সেহেতু সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

১০. সংবিধান সংশোধন: ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সংশোধনের যে ব্যবস্থা রাখা হয় তাকে নমনীয় বলা যায়। সাধারণ সংশোধনীসমূহ সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি নিয়ে সংবিধান সংশোধন করার ব্যবস্থা ছিল। তবে উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রপতির সম্মতি নেবার প্রয়োজন ছিল।

গ. সংবিধানের কার্যকারিতা

১৯৫৬ সালে প্রণীত সংবিধান চালু ছিল মাত্র দু'বছর। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে '৫৬ সালের সংবিধান এবং এই সঙ্গে পাকিস্তানের সাংবিধানিক শাসনের সমাপ্তি ঘটান। তবে যে দু'বছর সংবিধান কার্যকর ছিল সে সময়কালে এর কার্যকারিতা, উপযোগিতা প্রভৃতি নিয়ে পন্ডিতজনরা দ্বিধা বিভক্ত ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, '৫৬ সালের সংবিধান কার্যকর হবার মত যথেষ্ট উপযুক্ত ছিল না। এতে অনেক অসঙ্গতি বিদ্যমান ছিল। আবার অন্য একদল মনে করতেন, এই সংবিধান কার্যকর হবার মত সময়ই পায়নি। প্রকৃত সত্যটি হয়ত এর মাঝামাঝি নিহিত।

'৫৬ সালের সংবিধানের বিষয়ে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক মহল এবং সুশীল সমাজ বিশেষ খুশি ছিল না। তারা এর প্রতিবাদও জানিয়েছিলেন। তারপরও হয়ত একটি সমাধানে পৌঁছানো যেত বা বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল। কিন্তু দু'বছর যেতে না যেতে সামরিক শাসন জারি হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর দায়িত্ব কম নয়। প্রকৃতপক্ষে এই এলিট শ্রেণী সাংবিধানিক শাসন চায় নি।

'৫৬ সালের সংবিধান কার্যকর না হবার পেছনে প্রধান কারণই হল সংবিধানে ক্ষমতার যে বিভাজনের কথা বলা হয়েছিল তা মেনে না চলা। কেন্দ্রীয় সরকার বার বার অযাচিতভাবে প্রাদেশিক সরকারের ওপর হস্তক্ষেপ তো করেছেই এমনকি সাংবিধানিক রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত অহেতুক কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেছেন। অর্থাৎ কেউ সঠিকভাবে সংবিধান মেনে চলেন নি। রাজনৈতিক দলগুলো বা রাজনৈতিক নেতারা যদি ঐক্যবদ্ধ হতেন তবে হয়ত সংবিধান লংঘনের এমন ঢালাও প্রবণতা রোধ করা যেত। এর পরিবর্তে রাজনীতিবিদরা পরস্পর কোন্দলে লিপ্ত হয়ে পরিস্থিতিকে আরো জটিল করেছেন।

সংবিধান প্রণয়নের পর দু'বছরেও কোন নির্বাচন যেমন সম্ভব হয়নি তেমনি নির্বাচিত সরকারের বদলে অন্যরা দেশ চালিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সংবিধান কার্যকর হওয়া খুবই দুরূহ। আইয়ুব খান সাংবিধানিক শাসন ব্যর্থ হবার জন্য বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের মাধ্যমে যে তদন্ত কমিটি করেছিলেন তাতে নির্বাচন না হওয়ার জন্য রাজনৈতিক নেতাদের কোন্দল এবং সরকারের কাজে অসাংবিধানিকভাবে অন্যদের হস্তক্ষেপের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়।

পাকিস্তানের শুরু থেকেই আমলারা অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করত সরকারের বিভিন্ন কাজে। এই প্রবণতা '৫৬ সালের সংবিধান প্রণীত হবার পরও বিদ্যমান ছিল। বরং বলা চলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করতে এই প্রবণতা আরো বেশি মাত্রায় প্রসার লাভ করে।

সব থেকে বড়কথা হলো পাকিস্তানের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ এবং পরবর্তী রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মীর্জা দু'জনই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন যাতে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া স্থায়ী রূপ লাভ করতে না পারে। শাসনতন্ত্র লংঘন করে তারা কেন্দ্রীয় সরকার অদল-বদল করছিলেন, প্রাদেশিক সরকারে অযাচিত হস্তক্ষেপ করছিলেন। কয়েকটি ঘটনা থেকে এ বিষয় আরো স্পষ্ট হবে কীভাবে নির্বাচিত সরকারকে অস্থিতিশীল করা হয়েছে। ১৯৫৬ সালে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দী সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। এদিকে পূর্ববাংলার গভর্নর ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমানকে

পদচ্যুত করেন (মার্চ ১৯৫৮)। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হন আবু হোসেন সরকার। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান পরের মাসে পূর্ববাংলার গভর্নর ফজলুল হককে পদচ্যুত করেন। নতুন গভর্নরের দায়িত্ব নেয়ার ১ ঘন্টার মধ্যে আবু হোসেন পদচ্যুত হন। মুখ্যমন্ত্রী হন আতাউর রহমান। জুন মাসে আবার তাঁকে পদচ্যুত করে আবু হোসেনকে পুনরায় নিযুক্ত করা হয়। মাত্র ৪ দিন পর আওয়ামী লীগ-ন্যাপ সমঝোতা হলে অনাস্থা ভোটে আবু হোসেন সরকার ক্ষমতাচ্যুত হন। পরের মাসে আবার মুখ্যমন্ত্রী হন আতাউর রহমান। পরিষদের এই অধিবেশনেই ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী নিহত হন। সুতরাং এমন একটি পরিস্থিতিতে সংবিধান কার্যকর না হওয়াই স্বাভাবিক।

ঘ. পূর্ববাংলায় এর প্রতিক্রিয়া

পাকিস্তানের শুরু থেকে একটি সংবিধান এবং সাংবিধানিক শাসনের জন্য পূর্ববাংলার মানুষ দাবি জানিয়ে আসলেও '৫৬ সালের সংবিধান তাদের আকাঙ্ক্ষার যথার্থ প্রতিফলন ঘটাতে পারেনি। সুতরাং এ বিষয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অনেকটাই নেতিবাচক।

একথা ঠিক পূর্ববাংলার দীর্ঘ দিনের দাবী যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, সংসদীয় ব্যবস্থা, প্রাদেশিক ক্ষমতায়ন এবং রাষ্ট্র ভাষার দাবী এই সংবিধানের মাধ্যমে পূরণ হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের ভেতর এটি কতটা কার্যকর করা সম্ভব হবে তা নিয়ে সন্দেহ তো ছিলই একই সঙ্গে নতুন কিছু উপাদান যোগ হয়ে সংবিধান বিষয়ে পূর্ববাংলার প্রতিক্রিয়া নেতিবাচক হয়ে পড়ে।

মারী সমঝোতার মাধ্যমে পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদরা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের সঙ্গে একটা সমঝোতার মাধ্যমে সংবিধান প্রণয়ন করলেও যখন দেখা গেল পূর্ববাংলার নাম বদলিয়ে 'পূর্ব পাকিস্তান ' করা হয়েছে, জনসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দেয়া হয়নি, পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানকে এক এক ইউনিট হিসাবে বিবেচনা করে সংখ্যা সাম্যনীতি গ্রহণ করা হয়েছে তখন স্বভাবতই এ সংবিধান আর পূর্ববাংলার মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য থাকেনি। আওয়ামী লীগ সংবিধান পাশ করার দিন অধিবেশন বর্জন করে। শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনও চলছিল। কিন্তু শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভেতর মতের মিল না থাকাতে শাসনতন্ত্র আন্দোলন বিশেষ জোরদার হয়নি। হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে শাসনতান্ত্রিক সংকটের এই পর্বে অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন। এ বিষয় নিয়ে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদে তিনি ২০টি উল্লেখযোগ্য ভাষণও দিয়েছিলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে '৫৬ সালের সংবিধান বিষয়ে পূর্ববাংলার মানুষের ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ছিল নেতিবাচক।

সারসংক্ষেপ

অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রম করে যে সংবিধান ১৯৫৬ সালে প্রণয়ন করা সম্ভব হল সেটি দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হয়নি। সংবিধানটি বিভিন্ন চক্রান্তের কারণে কার্যকর করা যায়নি। একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার আগেই সামরিক শাসন জারি করে সংবিধানকে অকার্যকর করা হয়। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া হয় বাধাগ্রস্ত। শুরু হয় পাকিস্তানের ইতিহাসে সামরিক শাসন।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জিঃ

১। মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯২।
২। আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর, টাউন লাইব্রেরী, ১৯৯৬।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৫৬ সালের-
(ক) ১৪ আগস্ট (খ) ২৩ মার্চ
(গ) ২৫ মার্চ (ঘ) ২৬ মার্চ।

২। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ধারা ছিল-
(ক) ১৩৪টি (খ) ২৩৪টি
(গ) ২৬৪টি (ঘ) ২৮৪টি।

৩। ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী গণপরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল-
(ক) ৩১০ (খ) ৩০০
(গ) ৩৩০ (ঘ) ৩৬০।

৪। ১৯৫৬ সালের সংবিধান কার্যকর ছিল-
(ক) ১ বছর (খ) ২ বছর
(গ) ৩ বছর (ঘ) ৪ বছর।

৫। ১৯৫৫ সালে গণপরিষদ অধিবেশন বসে-
(ক) দিল্লি (খ) করাচি
(গ) মারী (ঘ) ঢাকা।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নঃ

১। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্র, সংসদীয় সরকার, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও মৌলিক অধিকার সম্পর্কে কি ধারা ছিল লিখুন।

২। ১৯৫৬ সালের সংবিধান সম্পর্কে পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদদের প্রতিক্রিয়া সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্নঃ

১। ১৯৫৬ সালে সংবিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

পাঠ-৪

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পটভূমি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ পড়ে আপনি-

- *১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন জারির পটভূমি আলোচনা করতে পারবেন;*
- *সামরিক শাসন জারির ঘোষণা সম্পর্কে জানতে পারবেন;*
- *সংসদীয় গণতন্ত্র অকার্যকর হওয়ার কারণ বর্ণনা করতে পারবেন।*

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এর শাসনব্যবস্থায় স্বৈরতান্ত্রিক এবং আমলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ১৯৫৮ সালে সরাসরি সেনা শাসন জারির পূর্ব পর্যন্ত যে শাসনামল তাকে বেসামরিক শাসন বলা গেলেও গণতান্ত্রিক শাসন বলা কঠিন। তাছাড়া সেনা শাসন জারির বেশ আগে থেকে দেশের শাসন প্রক্রিয়ার ভেতর সেনাবাহিনীর পরোক্ষ ভূমিকা ও প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছিল। শুরু থেকেই পাকিস্তানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব এবং চক্রান্তের রাজনীতি চলছিল। এমনি একটি পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল খুব অবাক হবার মত কোন ঘটনা নয়।

ক. পটভূমি

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে স্নায়ুযুদ্ধ চলার সময়ে প্রায়ই সেনা শাসন জারি হতে দেখা যায়। কিন্তু সেনা শাসন হঠাৎ করেই আসত না। বরং এর পেছনে একটা পটভূমি বা প্রেক্ষাপট থাকত বা তৈরি করা হতো। পাকিস্তানও এ প্রক্রিয়ার বাইরে নয়। শুরু থেকে পাকিস্তানে আমলা, রাজনীতিবিদ, বিত্তবান, সেনা কর্মকর্তাদের ভেতর এক ধরনের অশুভ আতাঁত লক্ষ করা যায়। এই এলিট গোষ্ঠীই শেষপর্যন্ত পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা সৃষ্টি করে এরাই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করেছে এবং শেষপর্যন্ত সেনা শাসনের সহায়ক হয়েছে। পাকিস্তানের সেনা শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পেছনে যেসব ঘটনা চিহ্নিত করা যায় তা হলো:

ক. যুক্তফ্রন্ট সরকার উৎখাত ও গণতন্ত্র বিকাশে বাধা: ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্টের নিকট রীতিমত পর্যুদস্ত হয়। এ পরাজয় ক্ষমতাসীন এলিটদের জন্য ছিল দারুণ আঘাত। সুতরাং তারা নির্বাচিত প্রাদেশিক সরকারকে অস্থিতিশীল এবং উৎখাত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। শেষপর্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে এবং মিথ্যা অভিযোগে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল বরখাস্ত করেন। এক্ষেত্রে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের '৯৪ক' ধারাকে ব্যবহার করা হয়। বরখাস্ত করার সময় যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয়। আদমজি জুট মিলের দাঙ্গার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারকে দায়ী করা হয় এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নির্বাচিত সরকারকে উৎখাতের ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু এমনিভাবে একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করা কোনভাবেই গণতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক বিধি সম্মত নয়। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে এভাবে উৎখাতের কারণে পুরো পূর্ববাংলার রাজনৈতিক চরিত্রই বদলে যায়। বিভিন্ন অন্তর্দ্বন্দ্ব

এবং দারুণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার উদ্ভব ঘটে। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত চলতে থাকে।

১. **যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব:** যুক্তফ্রন্ট ছিল একাধিক রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত একটি রাজনৈতিক জোট। নির্বাচনে জয়লাভের পর পর মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে ফ্রন্টের ভেতর অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়।এই অন্তর্দ্বন্দ্বে শেরে বাংলা ফজলুল হকের ভূমিকাই বেশি দায়ী ছিল। শেষপর্যন্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের একটা সুরাহা হলেও তা ছিল আপাত সমাধান। পরবর্তীকালে এই দ্বন্দ্ব আবার দেখা দেয় এবং যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। প্রদেশে দারুণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা দেয় যা প্রকারান্তে ষড়যন্ত্রকারীদের টিকে থাকার সুযোগ করে দেয়।

২. **১৯৫৬ সালের খাদ্যভাব ও সরকারের ব্যর্থতা:** ১৯৫৬ সালে দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেয়। সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হলে শেষপর্যন্ত দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। সরকারের এই ব্যর্থতা অনেকটা অদক্ষতার নামান্তর। তারা সঠিক সময়ে খাদ্য আমদানী করে পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ হয়। ফলে দেশের মানুষ স্বভাবতই সরকারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। দেশে অস্থিতিশীলতার উদ্ভব হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সব সময়ই অগণতান্ত্রিক শক্তি উৎসাহিত হয়। এমন কি ভুখা মিছিলে গুলি করে অনেক লোকও হত্যা করা হয়।

৩. **আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং আওয়ামী লীগ সরকার বরখাস্ত:** যুক্তফ্রন্ট সরকার বরখাস্ত, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের এক পর্যায়ে নির্বাচনী জোট যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যায়। ফ্রন্টের প্রধান শরীক দল আওয়ামী লীগ আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে নতুন করে প্রাদেশিক সরকার গঠন করে। কিন্তু এতে করে পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। বরং ষড়যন্ত্র চলতেই থাকে। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেও শুরু হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান এবং দলের মহাসচিব শেখ মুজিবুর রহমান পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ এরই সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকারকে বহিস্কার করে। অন্যদিকে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতা সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়। এ অবস্থায় দেশের বিশেষ করে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চরমে পৌঁছে। প্রাদেশিক সরকার নিয়ে রীতিমত মিউজিক্যাল চেয়ার শুরু হয়ে যায়।

৪. **ডেপুটি স্পিকার হত্যা:** যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গে যাবার পর পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগ এবং কৃষক-প্রজা পার্টির ভেতর দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছিল। প্রাদেশিক সরকার নিয়ে দু'পক্ষের লড়াই ছিল তিক্ততম পর্যায়ে। এরই এক পর্যায়ে ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পূর্ববাংলার আইন পরিষদে বিরোধী দল কৃষক-প্রজা পার্টির আক্রমণের এক পর্যায়ে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মাথায় আঘাত পেয়ে নিহত হন। ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর মৃত্যু ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য দারুণ সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। বলা যায় এই ঘটনা সেনা শাসন আনয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রত্যক্ষ নিয়ামক হিসাবে কাজ করে।

৫. **ইস্কান্দার মীর্জার অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত:** ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা দেশে সামরিক আইন জারি করেন। তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, অস্থিতিশীল সরকার, অবাধ দুর্নীতি, রাজনৈতিক কোন্দল, সংবিধান অকার্যকর হওয়া প্রভৃতি কারণে তাঁর পক্ষে দর্শক হয়ে থাকা সম্ভব হয়নি; বরং সেনা শাসন জারিতে তিনি বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু ইস্কান্দার মীর্জার এই আচরণ ছিল অগণতান্ত্রিক, সংবিধান বিরোধী এবং স্বার্থতাড়িত। যেসব অভিযোগে তিনি সামরিক শাসন জারি করেছিলেন তার দায়িত্ব তিনি নিজেও এড়াতে পারেন না; উল্টো এসব পরিস্থিতির বেশির ভাগের পেছনেই তাঁর হাত ছিল। তাছাড়া ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুসারে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতির এ ধরনের কোন চরম সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার ছিল না। তিনি প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক

আমলাবর্গ এবং এলিট গোষ্ঠীর প্রতিভূ হিসাবে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের নিমিত্তে সেনা শাসন জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৬. **আইয়ুব খানের ক্ষমতা লাভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা:** ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মীর্জা সেনা শাসন জারি করলেও নেপথ্য শক্তি ছিলেন আইয়ুব খান। তিনি ছিলেন ক্ষমতা লিপ্সু ব্যক্তি। আগেও এর নজির দেখা গেছে। তিনি সেনা প্রধান থাকা অবস্থায় মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেছিলেন। এবারে তাঁর সামনে পুরো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলই সহজ করে দিয়েছেন ইস্কান্দার মীর্জা। সেনাবাহিনী ছিল আইয়ুবের অনুগত। সুতরাং ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক জারি করা সামরিক আইন অল্প ক'দিনের ভেতরই আইয়ুব খানের অধীন চলে গেল। মীর্জাকে সরিয়ে আইয়ুব ক্ষমতা দখল করে নিলেন। শুরু হয়ে যায় দশ বছর ব্যাপী আইয়ুবী সেনা ও আধা সেনা স্বৈরশাসন।

খ. সামরিক শাসন ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং সেনা প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। সামরিক আইন জারি করা হয় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে। যেখানে রাষ্ট্রপতি সামরিক শাসন জারির কারণ হিসাবে দুর্নীতি, কোন্দল, অস্থিতিশীলতা প্রভৃতিকে চিহ্নিত করেন। গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে দেশের সংকট দূর হবে না তা মীর্জা তাঁর ভাষণে স্পষ্ট করে বলেন, "আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর মানসিকতা এতই নীচে নেমে গেছে যে, আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমানের গোলযোগপূর্ণ অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির উন্নতি ঘটবে। নির্বাচনে জয়ী হলে তারা পুনরায় দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন।" তিনি আসন্ন নির্বাচনের মাধ্যমেও সমস্যার কোন সমাধান দেখছেন না বলে ঘোষণা করেন। সামরিক শাসনের ঘোষণা দিয়ে বলা হয়:

ক. ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল থাকবে।

খ. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারসমূহ বরখাস্ত করা হলো।

গ. জাতীয় পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক পরিষদসমূহ ভেঙ্গে দেয়া হলো।

ঘ. সকল রাজনৈতিক দলের কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো।

ঙ. বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত সেনা শাসন বহাল থাকবে।

এভাবেই ১৯৫৮ সালের সেনা শাসনের শুরু। পরবর্তীকালে আরো একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেখা যায় প্রধান সামরিক শাসকের আদেশ জারি করা হয়। ২৭ অক্টোবর আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতির পদও দখল করেন। তখন থেকে তাঁর নামেই সেনা শাসন শুরু হয়।

গ. সংসদীয় গণতন্ত্র অকার্যকর হবার কারণ

পাকিস্তানের সূচনা থেকেই জনগণের সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন দাবি বা আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল এটির প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া আর কখনোই সম্ভব হয়নি। বিভিন্ন পর্যায়ের চেষ্টা নানা কারণে

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রের এই ব্যর্থতা দু'পর্যায়ে আলোচনা করা যায়। এক পর্যায়ে আছে সেনা শাসক আইয়ুবের তদন্ত কমিশন রিপোর্ট এবং অন্য পর্যায়ে বিশেষজ্ঞদের উদ্‌ঘাটিত কারণসমূহ।

১. আইয়ুব খান ক্ষমতা দখলের পর সংসদীয় গণতন্ত্র কেন ব্যর্থ হলো সে বিষয়টি তদন্ত করার জন্য বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। তদন্ত কমিশনের আরো একটি কাজ ছিল পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধান সম্পর্কে সুপারিশ করা। কমিশন ১৯৬১ সালে পেশকৃত রিপোর্টে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হবার অন্তত তিনটি উল্লেখযোগ্য কারণের কথা বলা হয়েছে:

ক. যথার্থভাবে ও যথা যথাসময়ে নির্বাচন না হওয়া।

খ. রাষ্ট্র প্রধান কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাজে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ।

গ. যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের ও সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক দলের অভাব এবং রাজনীতিবিদদের প্রশাসনে হস্তক্ষেপ।

আইয়ুব খানের নিযুক্ত কমিশনের বক্তব্য এরূপ হলেও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন প্রকৃত সত্য আরো অন্য রকম এবং বিস্তত ছিল।

২. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই এর ক্ষমতা এক শ্রেণীর এলিটদের হাতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। একই সঙ্গে দেশের রাজনীতিবিদরাও বিশেষ কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেনি। সুতরাং সংসদীয় গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার মত উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেনি পাকিস্তানে।

ক. **জিন্নাহর অনীহা:** মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে অসীম প্রভাবের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে সংসদীয় গণতন্ত্রে কতটা আগ্রহী ছিলেন তাতে সন্দেহ আছে। অন্তত তাঁর গভর্নর জেনারেল হওয়া, আমলাদের প্রাধান্য দেয়া, নামমাত্র মন্ত্রী রাখা প্রভৃতি আচরণ তাই প্রমাণ করে।

খ. **রাষ্ট্রপ্রধানদের অযাচিত হস্তক্ষেপ:** পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধানের পদে শেষপর্যন্ত যেসব ব্যক্তিবর্গ বসেছেন তাঁরা সবাই সরাসরি সরকারের কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করেছেন। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে প্রায়ই অসাংবিধানিকভাবেও তারা ভূমিকা পালন করেছেন। মন্ত্রিসভা বাতিল বা যথেচ্ছাভাবে পরিবর্তন করেছেন। এ ধরনের আচরণ কোন ক্রমেই সংসদীয় গণতন্ত্রের সহায়ক ছিলনা।

গ. **প্রতিষ্ঠান ও ঐতিহ্যের অভাব:** সংসদীয় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করার জন্য সব সময়ই উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং ঐতিহ্যের প্রয়োজন হয়। কিন্তু পাকিস্তানে এ দু'টিরই প্রকট অভাব লক্ষণীয় মাত্রায় ছিল।

ঘ. **রাজনৈতিক দলের অভাব:** সারা দেশ ব্যাপী সুগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন কখনোই পাকিস্তানে গড়ে ওঠেনি। এর বদলে শক্তিশালী আঞ্চলিক দলের বিকাশ দেখা গিয়েছিল। এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা যেমন দেখা দেয় তেমনি সংসদীয় গণতন্ত্রের বিকাশও বাধাগ্রস্ত হয়। মুসলিম লীগের একটি জাতীয় পরিচয় থাকলেও দলটি পরে দুর্বল হয়ে যায়।

ঙ. **আমলাতন্ত্র ও এলিট শ্রেণী:** আমলাতন্ত্র এবং ক্ষমতায় আসীন গণভিত্তিহীন এলিট শ্রেণী সব সময়ই চেয়েছে যে কোন উপায়ে ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে। তাদের এই প্রচেষ্টা অনেক ষড়যন্ত্র, অস্থিতিশীলতার জন্ম দিয়ে পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক বিকাশকে অসম্ভব করে তুলেছিল।

চ. **নির্বাচন না হওয়া:** গণতন্ত্র বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য নির্বাচন খুবই জরুরি। কিন্তু ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত কোন জাতীয় নির্বাচনই সম্ভব হয়নি পাকিস্তানে। এতে করে রাজনৈতিক শক্তি বিকশিত তো হয়ইনি; উল্টো অগণতান্ত্রিক শক্তিই দিন দিন পুষ্ট হয়েছে।

ছ. **রাজনৈতিক এবং সরকারের অস্থিতিশীলতা:** পুরো পাকিস্তান আমলই ছিল রাজনৈতিক এবং সরকারের অস্থিতিশীলতার প্রদর্শনী। ঘনঘন সরকার বদল, রাজনৈতিক দলগুলোর তিক্তভাবে পরস্পর বিরোধিতা গণতন্ত্রের জন্য কখনোই শুভ ফল বয়ে আনেনি।

জ. **অদক্ষ ও সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতা:** সংসদীয় গণতন্ত্রে সব সময়ই দক্ষ এবং ত্যাগী রাজনৈতিক নেতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পাকিস্তানে দু'একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে এমন নেতা সত্যিই বিরল ছিল। বরং নেতারা সুবিধা, ক্ষমতা এবং বিত্তের কাছে বার বার হার মেনে গণতন্ত্রের সর্বনাশ ঘটিয়েছেন।

সারসংক্ষেপ

একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে নানাবিধ পরিস্থিতির কারণে পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছিল। আর সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতার সুযোগেই শেষপর্যন্ত সেনা শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন হবার পর থেকে যেভাবে দেশ চলছিল তাতে দিনে দিনে একটি অগণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপট সবার অজান্তেই তৈরি হচ্ছিল। সেই প্রেক্ষাপটের ওপর ভর করে সেনাবাহিনী ক্ষমতার মঞ্চে আবির্ভূত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

১। মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ : স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা*, ঢাকা, ইউপিএল, ১৯৯২।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন:

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। পূর্ববাংলা আইন পরিষদের ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী নিহত হন ১৯৫৮ সালের-

(ক) ১৩ সেপ্টেম্বর (খ) ১৫ সেপ্টেম্বর

(গ) ২৩ সেপ্টেম্বর (ঘ) ২৫ সেপ্টেম্বর।

২। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন-

(ক) আইয়ুব খান (খ) ইয়াহিয়া খান

(গ) টিক্কা খান (ঘ) ইস্কান্দার মীর্জা।

৩। জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ দখল করেন ১৯৫৮ সালের-

(ক) ১৪ অক্টোবর (খ) ১৫ অক্টোবর

(গ) ১৭ অক্টোবর (ঘ) ২৭ অক্টোবর।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। ইস্কান্দার মির্জা ও আইয়ুব খান কিভাবে সামরিক শাসনের পথ তৈরি করেন লিখুন।

২। সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হবার ৫টি কারণ চিহ্নিত করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১। ১৯৫৮ সালের সামরিক শাসনের পটভূমি আলোচনা করুন। সংসদীয় গণতন্ত্র অকার্যকর হওয়ার কী কী কারণ আপনি চিহ্নিত করেন?

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরমালা:

পাঠ-১: ১। (ঘ); ২। (গ); ৩। (খ); ৪। (ঘ); ৫। (২); ৬। (ঘ); ৭। (গ); ৮। (খ); ৯। (খ)।

পাঠ-২: ১। (খ); ২। (ক); ৩। (ঘ); ৪। (খ); ৫। (গ); ৬। (ঘ); ৭। (গ)।

পাঠ-৩: ১। (খ); ২। (খ); ৩। (ক); ৪। (খ)।

পাঠ-৪: ১। (গ); ২। (ঘ); ৩। (ঘ)।